যায়যায়দিন

তারিখ 23 JAN 2010
পৃষ্ঠা 6 কলাম

# শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

কোনো শিক্ষাব্যবস্থা একদিনে গড়ে ওঠে না এবং রাতারাতি পরিবর্তনও করা যায় না। সেজন্য শিক্ষানীতি নিয়ে আনকোরা কথা বলার সুযোগ কম। শিক্ষার নানাবিধ অভাব ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশ দান এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথনির্দেশের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওই বছর ২৪ সেপ্টেম্বর কমিশনের উদ্বোধন করেন। ১৯৭৩ সালের ৮ জুন কমিশন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কাছে অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করে। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ৩০ মে ১৯৭৪। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত-এ-খুদাকে সভাপতি করে গঠিত বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের ওই রিপোর্ট এখন পর্যন্ত শিক্ষা সংক্রান্ত সবচেয়ে বিশদ, পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য প্রতিবেদন। কিন্তু পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার পর ক্ষমতাসীনরা ওই নীতি বাস্তবায়নের ধারেকাছে না গিয়ে বিভিন্ন সময় শিক্ষা সংস্কারের নামে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন প্রস্তাব ও কার্যক্রম গ্রহণে লিপ্ত হয়। সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে সামগ্রিকভাবে সমাধানে ব্রতী হওয়ার চেয়ে জোড়াতালি দেয়ার মানসিকতাই ছিল সেখানে প্রধান। তারপরও পঁচাত্তর পরবর্তী প্রতিটি শিক্ষা সংস্কার প্রস্তাবে কোনো না কোনোভাবে ড. কুদরাত-এ খুদা রিপোর্টের শব্দ, শব্দমালা, বাক্যাংশ যুক্ত হয়েছে। কারণ তা না করে উপায় ছিল না। তবে উদ্দেশ্য সাধু না হওয়ায় ওইসব উদ্যোগ শিক্ষাক্ষেত্রে মৌলিক কোনো অবদান রাখতে পারেনি। ১৯৭৯ সালে জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনামলের অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি (কাজী জাফর-আবদুল বাতেন), এরশাদ সরকারের সময় ১৯৮৩ সালে মজিদ খান ও ১৯৮৭ সালে মফিজউদ্দিন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ২০০৩ সালে খালেদা জিয়ার শাসনামলের জাতীয় শিক্ষা কমিশন (মনিরুজ্জামান মিঞা) প্রতিবেদন তারই উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এর ব্যতিক্রম ছিল ২০০০ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ের জাতীয় শিক্ষানীতি, যা এখন পর্যন্ত জাতীয় সংসদে পাসকৃত একমাত্র শিক্ষানীতি। তারই ধারাবাহিকতায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকারের সময় জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে 'চেয়ারম্যান' ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমানকে কো-চেয়ারম্যান করে গঠিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০০৯ সম্প্রতি তাদের রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেছে। আগেই উল্লেখ করেছি, যে কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমে বিকাশ লাভ করে। যেখানে হঠাৎ নতুন কিছু বলা বা করার অবকাশ কম। সেজন্য রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিকতায় পার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন সময় শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাবনা ও নীতিমালার মধ্যে লক্ষণীয় সাদৃশ্য রয়েছে। তবে শব্দচয়ন, বাক্যবিন্যাস, প্রস্তাব ও সুপারিশে উল্লেখযোগ্য মিল থাকলেও বৈষম্য-বঞ্চনা নিরসন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ, যুগোপযোগী সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রাসঙ্গিকতায় ব্যবধান বিশাল ও ব্যাপক। অন্যান্য যেখানে গতানুগতিকতায় আস্থাশীল, দোদুল্যমান, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি সেখানে সৃজনধর্মী, সাহসিকতায় অনন্য ও ব্যতিক্রমী।

সব স্তরের জনগণ ও তাদের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করে, সময় ও প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ, পরিমার্জন, সংযোজন ও বিন্যস্তকরণের বিধানসংবলিত প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষানীতির বিভিন্ন প্রস্তাব ও সুপারিশের বেশিরভাগ নিয়ে বিরোধ বা মতপার্থক্য নেই। ২৪টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের একটি নিয়েও কোনো বিতর্ক নেই। আপত্তি শুধু দুটি শব্দে : 'সেক্যুলার' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। ২৯টি অধ্যায়ের মধ্যে ২০টির বেশি নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। যে ৯টি নিয়ে মতপার্থক্য তাও আংশিক অথবা অনুল্লেখযোগ্য। বিরোধের ক্ষেত্রটি মূলত রাজনৈতিক। সেই সঙ্গে অর্থ সংস্থান ও ভৌতকাঠামো উন্নয়ন প্রশ্নে বিবেচনা করে বাস্তবায়ন যোগ্যতা নিয়ে সংশয়। যেমন বিএনপি আমলের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেছেন, 'শিক্ষানীতির খসড়াটি বেশ ভালো। এর বর্ণনা সাধারণ মানুষ পড়েও বুঝবে। তবে কিছু বিষয় নিয়ে আমার আপত্তি আছে। বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। নীতিগতভাবে এটা সমর্থন করি, প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করতে পারলে ভালো। কিন্তু এটা অনিবার্য নয়, বাস্তবে এটা অসম্ভবও বটে। কারণ ৮০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগ এবং পুরনো শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এ বিশাল কর্মযজ্ঞের পেছনে ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে।' (প্রথম আলো)। আবার বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে প্রণীত মনিরুজ্জামান মিঞা রিপোর্ট ২০০৩-এ বিষয়টি উপস্থাপিত হয় এভাবে : 'স্বাধীন বাংলাদেশে এ পর্যন্ত গঠিত অধিকাংশ শিক্ষা কমিশন ও কমিটি পাঁচ বছরের স্থলে আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে। যাই হোক না কেন বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আট বছর মেয়াদি করার যুক্তিযুক্ত কারণ:

> শিক্ষা কোনো রাজনীতি ও অন্ধ দলীয় বিবেচনার বিষয় নয়। অন্তত শিক্ষাকে সব দলীয় বিবেচনার উর্ধ্বে রাখা দরকার। এ পরিপ্রেক্ষিতে মতাদর্শ ও দলীয় অবস্থান, সরকারি দল, বিরোধী দল নির্বিশেষে সংসদ সদস্যরা শিক্ষানীতি নিয়ে যার যা বক্তব্য আছে সংসদে উপস্থিত হয়ে তা রাখতে পারেন।

মহলের সতর্কতা ও সাবধান বাণীকে উপেক্ষা করে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের সপক্ষে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেন। একইভাবে তারই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা দেশের শিক্ষার ৯৮ ভাগ দায়িত্ব পালনকারী বেসরকারি শিক্ষকদের বিনা আন্দোলনে বেতনভাতা দেয়ার সিদ্ধান্তই শুধু নয়, শিক্ষকতায় মেধা আকর্ষণে শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেলের ঘোষণা দিয়েছেন যা ইতিমধ্যেই মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। তার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে বেসরকারি কলেজে সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে যাচ্ছেন। পদোন্নতির ক্ষেত্রে রেশিও প্রথা বাতিল হতে যাচ্ছে। নানামুখী অন্তর্ঘাত ও চক্রান্ত সত্ত্বেও শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ইতিমধ্যেই মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদানের মতো অসম্ভব কাজ সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীদের সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠান সম্ভব হবে কি হবে না, তা নিয়েও কারো কারো সংশয়-আশঙ্কা কম ছিল না। বিপুল উৎসাহের সঙ্গে আমাদের কিশোর-কিশোরীরা তাতে অংশ নিয়েছে। পত্রপত্রিকায় এ পরীক্ষার শিরোনাম হয়েছে, 'ছোটদের এসএসসি'। সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর এ পরীক্ষার ফলও প্রকাশ হয়ে গেছে। অনেকের মতো আমিও বিশ্বাস করি, শেখ হাসিনার নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিক সহযোগিতায় বাংলাদেশে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নীতকরণও অবশ্যই সম্ভব হবে। সংশয়বাদীরা যথারীতি সংশয় প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু তা যে বর্তমান সরকারের মেয়াদকালেই কার্যকর হবে তাতে আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নেই। শুধু প্রাথমিক শিক্ষা নয়, সর্বস্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হবে। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিও ইংরেজি নতুন বছর ২০১০-এর শুরু থেকেই কার্যকর হবে।

এ কথা সত্য, একসঙ্গে বা এক ধাপে সব পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। তবে ক্রমান্বয়ে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি, ভৌত কাঠামো উন্নয়ন, পর্যায়ক্রমে নতুন নতুন শিক্ষক নিয়োগ ও কর্মরতদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মর্যাদার সঙ্গে জীবনধারণ উপযোগী বেতনভাতা ও পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষানীতির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য: 'মনে রাখতে হবে এর বাস্তবায়নে ৯ বছর লাগবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। কাজেই অর্থের সংস্থান নয় বছরেই করতে হবে। প্রথম দুই-তিন বছর কিছু সমস্যা দেখা দিলেও পরে অর্থের সঙ্কট না হওয়ার কথা। জাতীয় আয়ের ছয় শতাংশ শিক্ষায় ব্যয় করতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে এই অনুপাত ২ দশমিক ১৭ শতাংশ। জাতীয় আয় যদি গড়ে ছয় বা সাত শতাংশ হারে বাড়ে এবং শিক্ষা ব্যয় ক্রমান্বয়ে ওই অঙ্গীকারকৃত পর্যায়ে পৌঁছে তাহলে অর্থের জোগান সহজেই হয়ে যাবে।'

শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে এ কথা বলা সমীচীন মনে করি, একটি নির্বাচিত সরকারকে শিক্ষাসহ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগণের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি ও তাদের প্রত্যাশা পূরণে যুক্তিসঙ্গত সময় প্রদান বাঞ্ছনীয়। মেয়াদের প্রথম দিকেই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের মতো জনকল্যাণমূলক কাজ শুরু করতে পারলে নির্বাচিত সরকারের পক্ষে তার মেয়াদকালের মধ্যে পুরোটা সম্পন্ন করতে না পারলেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ করে ফেলা সম্ভব হবে। তাহলে শিক্ষাসহ বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ধারাবাহিকতা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সৎ ও গঠনমূলক প্রতিযোগিতাও উৎসাহিত, প্রণোদিত হবে। এর ফলে অতীতের মতো সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন শিক্ষানীতি তৈরির প্রবণতাও বন্ধ হবে। এসব পরিপ্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে যেহেতু প্রস্তাবিত ২০০৯-এর শিক্ষানীতির অধিকাংশ বিষয় নিয়ে কোনো মতপার্থক্য বা বিরোধ নেই, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার যে কোনো পর্যায়ে সংযোজন ও সংশোধনের সুযোগ থাকবে, সেজন্য অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির বাস্তবায়নের কাজ অবিলম্বে শুরু করা দরকার। শিক্ষা কোনো রাজনীতি ও অন্ধ দলীয় বিবেচনার বিষয় নয়। অন্তত শিক্ষাকে সব দলীয় বিবেচনার উর্ধ্বে রাখা দরকার। এ পরিপ্রেক্ষিতে মতাদর্শ ও দলীয় অবস্থান, সরকারি দল, বিরোধী দল নির্বিশেষে সংসদ সদস্যরা শিক্ষানীতি নিয়ে যার যা বক্তব্য আছে সংসদে উপস্থিত হয়ে তা রাখতে পারেন।

প্রাথমিক শিক্ষা দেশের একটি বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য সমাপনী স্তর। এ স্তরের শিক্ষা শেষে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে জীবন ও জীবিকার জন্য বিভিন্ন পেশা গ্রহণসহ শ্রমবাজারে প্রবেশের চিন্তা করতে হয়। খুব সম্ভবত এসব বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে আট বছর মেয়াদি করার বিষয় সুপারিশ করা হয়েছিল। তবে এ মুহূর্তেই সম্ভবত তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।'

এ কথা সত্য, কিছু মানুষ প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন একেবারে অসম্ভব মনে করে থাকে। কিন্তু যারা স্বাধীন সত্তায় বিশ্বাসী, ইতিবাচক পরিবর্তনের ঝুঁকি নিতে তারা ভয় পান না। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ধাপে ধাপে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনার ক্ষেত্রে কালজয়ী ভূমিকা পালনকারী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পর চরম আর্থিক অনিশ্চয়তা ও প্রভাবশালী

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ: শিক্ষাবিদ
principalqfahmed@yahoo.com